OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 433 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 433 - 439
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘মহুলবনীর মায়াম’ বনাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আধিপত্যবাদ

জয়া দাস
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: jaya25das@gmail.com

ও

অধ্যাপক সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ
Email ID: saurenugb@gmail.com

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Superstition, work, violation, democratic, conservative, culture, rules, ideals.

Abstract
Tapan Banerjee is the 'literary baridhi' of Bengali literature. Despite being a resident of the city of Kolkata, he had to travel to various parts of rural Bengal due to his work. While he was an SDO, he was posted in Mahulbani, a remote area of Medinapur. He not only performed the duties of a government official, but also immersed himself in work with kindness as a guardian of the place. Mahulbani is a village inhabited by Santals. Although the livelihood, various festivals, dance-songs, and culture of the Santals are covered by their own culture, their social system is mainly controlled by the Panchayat. Mahatma Gandhi has raised the ideal of the Panchayat system for the development of villages in India. The rules and regulations of the Santals are completely different. When someone tried to violate the traditional rules and regulations, a terrible consequence was met. A scientific agreement and understanding were needed to change the Santal society, which was shrouded in illiteracy and superstition. But the Panchayat system, while making their social life conservative, also took away the democratic rights of the people like a rock. People had to accept whatever the Panchayat judged blindly. In some cases, tradition has tied their lives to the Ashtapis. The Panchayat system of India has been stable for a long time in the village-centered lifestyle. In Bengal too, the main tone of this Panchayat system was the Chandimandap culture in Hindu society. The works of everyone from Sarat Chandra to Tarashankar show the identity of such Chandimandap-centered Panchayat justice system. But Tapan Banerjee's 'Mahulbani' has taken the matter to a slightly different level. He is initiated into the ideals of Rabindranath. So he is not disturbed by any problem. In the novel 'Mahulbani Mayam' he has shown multiple problems. For example, the problem of Phutik's father's identity, the problem of Elizabeth's Phulmani's caste certificate, the problem of Sripati Sohag's caste problem of

marriage due to differences, the problem of Nakul's dream, the witch slander of Maya Hansda etc. He has tried to find solutions to such multidimensional problems everywhere except for one or two and has also achieved success. Even in the Santal society where outsiders (outsiders) are not respected, he has shown them the way to a good solution.

Discussion

সাহিত্যিক তপন বন্দোপাধ্যায়ের বাল্য ও কৈশোর কাল কেটেছে গ্রামে। সুতরাং গ্রাম জীবনের প্রতি তার একটা শিকড়ের টান রয়েছে। কর্মসূত্রে তিনি জেলা শহরগুলিকে যেমন দেখেছেন তেমনি কাছ থেকে দেখেছেন প্রান্তীয় মানুষের জীবন যাপনের বৈচিত্র্য। স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন ঘটে। গ্রাম পঞ্চায়েতেও নব পর্যায়ের ইতিহাস সূচিত হয়। নেতারা পঞ্চায়েতের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। কারণ গান্ধীজির সংগ্রামের ভিত্তি ছিল পল্লী। তিনি গ্রাম-স্বরাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়ে বুঝিয়েছেন -

> "এটি হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ এক সাধারণতন্ত্র যে তার নিজের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে প্রতিবেশী গ্রামের ওপর পারস্পরিক নির্ভরতায় সংযুক্ত হবে। পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত পঞ্চায়েত গ্রামের শাসন চালাবেন। নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রামের বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ প্রতিবছর এই পঞ্চায়েত নির্বাচন করবেন। এই পঞ্চায়েতের প্রয়োজনীয় সব কর্তৃত্ব বা অধিকারই থাকবে। ...ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে এখানে থাকবে এক পুর্নাঙ্গ নিখুঁত গণতন্ত্র।"[১]

ভারতবর্ষের সংবিধানে গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলাদাই আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৫৭ সালের আইন অনুযায়ী ১৯৭৩ সালেও পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পঞ্চায়েত গঠনের ধারা ন্যস্ত থাকে। প্রতিটি ন্যায় পঞ্চায়েতের স্থাপনের পর সেগুলির কার্যকাল নির্ধারিত থাকে পাঁচ বছর। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। পরের বছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ত্রি-স্তরের স্ব-শাসিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু আছে। যা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ দ্বারা। পরবর্তীতে ও ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করে। গেজেট প্রকাশ করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশোধিত প্রশাসনিক নিয়মাবলী প্রকাশ করা হয়।

সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকার পঞ্চায়েতের নিয়ম কানুন হয় ভিন্নধারার। তারা তাদের সমাজ ব্যবস্থায় দিকুদের অর্থাৎ বাইরের লোকদের হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়। আজকের ভারতবর্ষে এই পঞ্চায়েতের কোথাও কোথাও দোর্দন্ড প্রতাপ লক্ষ্যণীয়। সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ থেকে শুরু করে জন্ম পরিচয় পত্র সর্বত্রই পঞ্চায়েতের হাতে থাকে। অসমবর্ণ বিবাহের কারণে পঞ্চায়েতের দেওয়া হুকুমে বিবাহ উন্মাদ প্রেমিক প্রেমিকাকে হত্যা করা অধিবাসী সমাজে এ ধরনের চিত্র প্রয়শ্চই ধরা পড়ে। সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় যোগমাঝির অঙ্গুরি হেলনে। সাঁওতাল সমাজে ফুলমণি এলিজাবেথের জীবনে যে বিপর্যয় হয়েছে তার সম্পূর্ণ দায়বর্তায় পঞ্চায়েতের ওপর। মোহুলবনীর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মোড়লদের বলা হয় যোগমাঝি। তাকে সাহায্য করার জন্য থাকে মুখিয়া। গ্রাম প্রধান নিযুক্ত থাকলেও কার্যত তার ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য।

মহুলবনীর সাঁওতালদের সমাজে এই যোগমাঝি মূলত বিচার ব্যবস্থায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সাঁওতাল সমাজ অনুমোদিত নয় এমন কোন কাজ করতে গেলে জরিমানা দিতে হয়। ফটিক টুডু তার উপজাতির শংসাপত্র আবেদন করেছে কিন্তু মহকুমা শাসককে শংসাপত্র সই করার পূর্বে যাচাই করে নিতে হয়। আবেদনকারীর ব্লক অফিস তার অনুমোদন পত্রে যথাযথ প্রমাণ দিয়েছে কিনা। ফটিকের জন্ম বাড়িতে হওয়ায় বার্থ সার্টিফিকেট নেই। তার জন্মদাতা পিতা রসিক টুডু জাতিতে সাঁওতাল আর পালক পিতা বসন্ত কুইল্যা জাতিতে নমঃশূদ্র। সমস্যা দানা বাঁধে সেখানেই। পূর্ণিমা টুডুর দুই সন্তান দুই স্বামীর ঔরসজাত। প্রথম সন্তান ফটিক প্রথম স্বামী রসিকের ছেলে। ফটিক যদি জন্মদাতা পিতার তপশিলি জাতিগত শংসাপত্র পেয়ে যায় তবে তার ভবিষ্যৎ চাকুরী কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বেশি পাবে। বনকাঁটায় সহরায় উৎসবে এস.ডিও সাহেব যাওয়ার উদ্দেশ্যে রসিক টুডুকে পূর্ণিমা পূর্ণিমা ও ফটিক সম্পর্কে তার জিজ্ঞাসাবাদ করা। তাদের সম্পর্কের কথা জানতে চাইলে অভিব্যক্তি হয় -

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 433 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে রসিক টুডু বললেন, না আমার ছেলে নয়। উ হাড়রাপ মায়জু (বদমায়েশ মেয়েলোক) -টা কার না কার বাচ্চা পেটে ধরেছে তার আমি কি জানি।"[২]

গর্ভস্থ সন্তানের পিতাকে একমাত্র তার মায়েরই সঠিক উত্তরটি জানা থাকে। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে নির্ভীকভাবে পূর্ণিমা, অকপটে স্বীকার করে ফটিকের বাবা আসলে তার কাকা মিলন টুডু। স্বামী নাবালে যাওয়ায় দেওর রোজ তার ঘরে আসে। প্রতিবাদ করতে গেলে ডাইনি অপবাদের ভয় দেখায়, যার চরম পরিণতি মৃত্যু। ডাইনির প্রাদুর্ভাবের কথা জ্ঞানগুরুর কান পর্যন্ত পৌঁছালে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করবে এক কথায়। এলাকাবাসীরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজের হাতে মানুষটিকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। পঞ্চায়েত এক্ষেত্রে কোনো সঠিক সমস্যা সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপ করে না উপরন্তু জ্ঞানগুরু নির্দেশকে যথার্থ মনে করে। সেই ভয়ে পূর্ণিমা এলাকার ছেড়ে ঘর বাঁধে অন্যত্র বেঁচে থাকার আশায়। সাঁওতালদের অন্দরমহলের কড়া নীতির ফলে সরকারিভাবে ও কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করা যায় না।

> "প্রশাসনক চাকরি করতে এসে সাহেব উপলব্ধি করেন কিছু সমস্যা মিটানো সম্ভব কিছু সমস্যা জোড়া তালি দিয়ে চালানো যায় কিছু সমস্যা থাকে যা পুরোপুরি কোনদিনও সমস্যা সমাধান করা যায় না"[৩]

মহুলবনীর বনবাতাস গ্রামের এলিজাবেথ ফুলমনি হেমব্রমকেও উপজাতির সমস্যা শংসাপত্র প্রদানে মহকুমা শাসককে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফুলমণি জাতিতে সাঁওতাল ধর্মসূত্রে খ্রিস্টান। সে নিজের নাম নিজেই রেখেছে ফুলটুংরি। মেদিনীপুর জেলায় নয়টি ব্লক। প্রতিদিনই কোন না কোন ব্লক থেকে এক বা একাধিক রিপোর্টসহ বিডিওর সুপারিশ আসে। রিপোর্ট যথাযথ থাকলে এসডিও সাহেব শংসাপত্রে নির্দিধায় স্বাক্ষর করে দিতে পারেন। ফুলমনির ক্ষেত্রে বিডিও অফিস থেকে রিপোর্ট না আসায় সে নিজেই দু'বছর ধরে চেষ্টা চালাতে থাকে। সাক্ষাৎ করে সাহেবের সাথে। জাতির শংসাপত্র প্রদানের প্রধান অন্তরায় হল তার গায়ের রঙ। সাহেবের বর্ণনানুযায়ী ফুলমণির চেহারার গড়ন এইরূপ -

> "এ জেলায় আসার পর যত সাঁওতাল মেয়ে চোখে পড়েছে তারা সবাই কৃষ্ণকায়, নাক কিঞ্চিত চ্যাপ্টা, মুখের গড়ন- নৃতত্ত্ববিদদের ভাষায় প্রোটো-অস্ট্রালয়েড। কিন্তু যে মেয়েটি এই মুহূর্তে আমার সামনে বসে তার গায়ের রং কবি লেখকদের ভাষায় গম রঙের।"[৪]

জাতিরগত শংসাপত্র প্রদানের নিয়ম অনুযায়ী গ্রাম প্রধানের নির্দিষ্ট ব্লকের সুপারিশ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ফুলমনির ক্ষেত্রে যোগমাঝি বুধন কিসকু গ্রাম প্রধান আনন্দ বেরাকে কড়া হুকুম জারি করে সুপারিশ না করার ক্ষেত্রে। অথচ ফুলমণির পিতৃ পরিচয় স্কুল সার্টিফিকেট ও আছে ভীম হেমব্রমের নাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের দৌরাত্ম্যের কাছে ভীত বি.এম.এইচও। পঞ্চায়েতের সভাপতি রমেশ দ্বিবেদী নির্দেশ দিয়েছে ফুলমনির বার্থ সার্টিফিকেটের কপি কাউকে না দেওয়ার। কারণ তার পিতৃ পরিচয় সন্দেহজনক। মায়ের নামে রটনা আছে। স্থানীয় চার্চে ফুলমনির মা বৃহস্পতি হেমব্রম ঘর ধোঁয়া মোছার কাজ করত। ফুলমনির গায়ের রং সাঁওতাল গোষ্ঠীর ন্যায় না হওয়ায় তাকে সেই সমাজ মেনে নেয়নি। সন্দেহ করা হয় বৃহস্পতি হেমব্রম গর্ভে লালিত ফুলমণি আসলে পাদরি জোসেফের ঔরসজাত। ফাদার জোসেফ চার্চে কর্মরত মহিলাদের কাউকে কাউকে সন্তানসম্ভবা করেছে। আরও এক কন্যা সন্তান উপহার দিয়েছেন তিনি আরো এক কন্যা সন্তান উপহার দিয়েছেন তিনি। এ ক্ষেত্রেও চিরন্তন সভ্যতার ইতিহাস মান্যতা পেয়েছে, বরাবরের মতো মেয়েটিকে হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়। উপায়ন্তর না দেখে গ্রাম ছেড়ে পাড়ি দেয় অন্যত্র। আর একটি পুত্র সন্তান হয়ে জন্ম নেওয়ায় তাদের ক্ষেত্রে এত সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

সরকারি বিধান অনুযায়ী শংসাপত্র দিয়ে থাকেন মহকুমাশাসক। নানান জটিলতার কারণে দীর্ঘদিন বিষয়টি নিয়ে টালবাহানা চলতে থাকলে ন্যাচারাল জাস্টিস ব্যাহত হয় বলে মনে করেন তিনি। ফুলমনিরকে ন্যায্য অধিকার দিতে এসডিও সাহেব চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রমেশ দ্বিবেদীর পরামর্শ অনুযায়ী নিজেই যান বনবাতাসের মুখিয়া দাশরথি মুখিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে। স্বশরীরে মুখিয়ার সম্মুখে বলেন -

> "দাশরথিবাবু, আপনার কথা অনেক শুনেছি। দশ-বিশটা গায়ের মানুষ আপনাকে মান্যগণ্য করেন। পাঁচ গাঁয়ের সমস্যা মেটাতে কুলহি ডাকলে আপনার মতামতকে বেশিই গুরুত্ব দেন সবাই।"[৫]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 433 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রশাসনিক পদে থেকে জনগণের কল্যাণে সমস্যার সমাধান করায় মানুষের ধর্ম বলে লেখক মনে করেন। তিনি যথেষ্ট বদ্ধ করে পরিকর, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে থাকেন মুখিয়াকে। সমস্ত পরিকল্পনায় প্রায় জল ঢেলে চেঁচিয়ে ওঠেন ‘ওদের মায়ামে পাপ ঢুকে গেছে’। আরো বলেন, ‘রক্তের পাপ কি সময়ের সঙ্গে ধুয়ে যায়!’ দাশরথি মুর্মু নিজেও স্বীকার করেন গাঁয়ের যোগমাঝি বুধন করা ধাতের মানুষ তাকে রাজি করানো সহজ নয়। স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যোগমা ঝির ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই।

ফুলমণি বুদ্ধিমতী সাহসী নির্ভীক। সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। উচ্চভিলাসী উচ্চাকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে। জাতির শংসাপত্রের জন্য দু'বছর অপেক্ষা করেছে। ফুলমনির দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবার যৎসামান্য আয়, তা দিয়ে দৈনন্দিন জীবন প্রতিপালন করাই দুষ্কর। স্টাইপেণ্ডের টাকা পায় না। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি স্পেশাল রেজোলিউশনে ফুলমণিকে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তাকে স্কুলের বেতন দিতে হয় না। ক্লাসের ফার্স্ট হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এই সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে। সেই অর্থে একজন প্রাইভেট টিউটরের বেতন সংকুলান করাও সম্ভব হয়নি। আরো ভালো রেজাল্টের জন্য ফুলমনি মনে করেছিল একজন ইংরেজি শিক্ষকের সহায়তা প্রয়োজন। ভবিষ্যতের শিক্ষা জীবন তথা ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা ফুলমণিকে আচ্ছন্ন করে। ঘটনাচক্রে ফুলমণির জীবনে মুশকিলাসান হয়ে উপস্থিত হয় জামশেদপুরের মাধ্যমিক স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক পরমেশ্বর মিশ্র। রাঁচিতে মূল নিবাস। কর্মসূত্রে থাকে জামশেদপুর। কয়েক মাস পত্রলাপের পর সে মনে করেছে ফুলমণি তার ঘরণী হওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ফুলমনি ও পরমেশ্বর বিবাহের পর জামশেদপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে এটাই তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ইতিমধ্যে সে বনবাতাসের হাসপাতাল থেকে বার্থ সার্টিফিকেটের কপি সংগ্রহ করেছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে ভর্তি হওয়ার প্রমাণপত্র। যেখানে রয়েছে পিতার নাম ভীম হেমব্রম ও মাতার নাম বৃহস্পতি হেমব্রম। সাথে রয়েছে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট। তার পরবর্তী পদক্ষেপ জামশেদপুর এ গিয়ে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের থেকে তপশিলি জাতির শংসাপত্রের জন্য আবেদন। সমস্ত কিছু জানিয়েছে সে সাহেব স্যারকে চিঠি লেখে। নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ফুলমণি এও জানায় -

> “আমার মনে হয় এগুলো ছাড়াই আমি কলেজে ভর্তি হতে পারবো আমার রেজাল্ট দেখিয়ে। টিউশন ফ্রি দিতে পারবে পরমেশ্বর। তবুও আমি জাতিসত্তার শংসাপত্র পেতে চাই আমার শিকড়ের কথা মনে রাখতে। আপনাকে প্রণাম।”[৬]

আজ থেকে চার দশক পূর্বে একটি সাঁওতাল মেয়ের এই পদক্ষেপ খুব সহজ ছিল না। এমনকি ঘটনা ক্রমে নানা সমস্যা এবং তার সুষ্ঠ সমাধানের পরিকল্পনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। পূর্ববর্তী সাহেবদের থেকে ফুলটুংরির সাহেব স্যার তথা ঔপন্যাসিক তপনবাবুকে তার আপন মনে হয়। মোট সাতটি চিঠি লেখে তিনি সংক্রান্ত তথ্য জামশেদপুরের প্রশাসনিক ভবনে পাঠাতে অনুরূপ অনিহা দেখাবেন না। যোগামাঝির গ্রামে এতটাই দৌরাত্ম যে ফুলমণির বাড়িতে গিয়ে শাসিয়ে আসে সে যেন জাতির শংসাপত্র প্রাপ্তির জন্য তৎপরতা না দেখায়। কথার খেলাফ হলে ফুলমণির পরিবারকে পুলিশ ডেকে গ্রামের মুখিয়া তাদের গ্রাম ছাড়া করে দেবার হুমকি দেয়। জাতিসত্তার প্রতি আবেগ ও শিকড়ের টানে সে যেন ঝাঁসি রানী হয়ে উঠেছে। শংসাপত্র প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায় গায়ের রং। যার নিয়ন্ত্রণ মানুষের হাতে থাকে না। যেখানে ভারতীয় নারীরা সৌন্দর্যনের মূল্য মূল লক্ষ্য ফর্সা হওয়া সেখানে ফুলমণি অন্বেষণ-

> “আমি অনেক দোকান খুঁজে বেরিয়েছি সেই ক্রিম যা মাখলে ফর্সা রং কালো হয়ে যায় সব দোকানে হেসেছে বলেছে পৃথিবীর ফর্সা হওয়ার ক্রিম পাওয়া যায় সব মেয়ে ফর্সা হতে চায়, কেউ কখনো শোনেনি ফর্সা মেয়ে কালো হতে চায়।”[৭]

পরমেশ্বর এর সাথে নতুন জীবনের পথে যাত্রার পূর্বে ফুলমণি তার স্বামীর স্কুলের প্রত্যেকটা দেখিয়ে যায় এসডিও সাহেব কে কারণ পরমেশ্বরের পাত্র হিসেবে কতটা সঠিক পরোক্ষভাবে যাচাই করে নেয় তার জীবনের ভরসাযোগ্য মানুষকে দিয়ে নির্দিষ্ট নিয়মে জামশেদপুরে আবেদন করা মাত্রই কিছুদিনের মধ্যেই ফুলমণি এলিজাবেথ হেমরম নামে বিহার সরকারের তরফ থেকে খাম এসে পৌঁছায় এসডিও অফিসে সাহেব যথা নিয়ম অনুযায়ী কাগজপত্র তথ্য পাঠিয়ে দেন যাতে ফুলমণির শংসাপত্রের আবেদন মঞ্জুর হয়। নিজ কর্তব্য পালন করে তিনি নিজেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন অত্যন্ত গ্রামের সাঁওতাল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 433 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অধ্যুষিত জনজাতি পরিবারে পালিত একটি মেয়ে নিজের বুদ্ধিমত্তার বলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে জাতিসত্তার পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছিল।

মহুলবনীতে প্রশাসক হিসেবে থাকাকালীন আরো একটি দুর্ঘটনা সম্মুখীন হতে হয় তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রেডিও মেসেজ পান বেড়াগেড়িয়া গ্রামের এক সাঁওতাল দম্পতি ডাইনি অপবাদে পিটিয়ে খুন করা হয়। সাংবাদিকরা সাধারণত সরকারপক্ষের বিপক্ষে রিপোর্ট করে থাকেন ঘটনা স্থল পরিদর্শনের সাথে নিয়েছিলেন ঘোষ বাবুকে। একসাথে যাবার কারণ একই ঘটনার উভয়পক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে বিরূপ সংবাদ পরিবর্তন করার কোন অবকাশ থাকে না। কোন অজানা এক জ্বরে গ্রামের দুটো শিশু পরপর মারা যায়, তারপর মারা যায় রতন মান্ডির দাদা। তাদের কেউই হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেনি জানগুরু মন্ত্র পড়ে গ্রামবাসীকে জানায় -

> "যার বাড়ির উত্তর দিকে একটা মহুয়া গাছ আছে সেই দম্পতি দাইন তাদের জন্যই অজানা জ্বর।"[৮]

রিপোর্টে জানা যায় বাইশশো টাকা জরিমানা করে গ্রাম পঞ্চায়েত রতন জায়গা জমি বিক্রি করে। শিরীষ গাছ বেলগাছ বিক্রি করে জরিমানার টাকা পরিশোধ করে। তারপরেও চব্বিশ হাজার টাকা জরিমানা হয়, সেই টাকা দিতে না পারায় রতন মান্ডি ও তার স্ত্রীকে জঙ্গলের মধ্যে ধরে নিয়ে যায় এবং পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। খুনের মোটিভ অন্বেষণে এস.ডিও সাহেব ক্রমাগত মস্তিষ্ক কাজে লাগান। প্রশ্ন করে জানেন তার দুই মেয়ে দুই জামাই এবং শালি জমি ছ'বিঘে। আইনত সেই শালি জমির ভাগীদার বর্তমান দুই কন্যা। রতন মান্ডির দাদা বৌদি দুজনেই সম্প্রতি মারা গেছেন এবং তারাও নিঃসন্তান। সাঁওতালদের নিজস্ব আইনত তাদের দুই ভাইয়ের সম্পত্তির অধিকারী তার ছোট ভাই হপনের। কোন সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামে মানুষের পরপর মৃত্যুর বা অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে কোন জানগুরুর কাছে জানতে চাইলে, জানগুরুর যদি কোন মানুষকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ডাইনির তকমা দিয়ে থাকে তখনই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। সম্পত্তি অধিগ্রহণই ছিল এই খুনের মূল উদ্দেশ্য। গ্রামের মাতব্বরেরা জানগুরুকে উসকে দেয়। যার মর্মান্তিক পরিণতি এই খুন। সাহেব নির্দেশ দেন -

> "তদন্তে যাঁদের নাম পাবেন সব অ্যারেস্ট করে কোর্টে চালান করে দিন।"[৯]

সমস্যা সমাধানতো দূরের কথা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পূর্বেই ঘটে গেছে গ্রামে দুটো মৃত্যু ডাইনি অপবাদে। সেখান থেকে ফিরছিলেন একরাশ স্তব্ধতা নিয়ে। সাঁওতাল সমাজ থেকে ডাইনির কনসেপ্ট দূরীকরনে অভিনব পন্থা অবলম্বন করার উদ্যোগ নিয়েছেন তপন বন্দোপাধ্যায়। মেদিনীপুরের একজন শিল্পীর ডাইনি বিষয়ক ডকুমেন্টারি গ্রামের লোককে দেখিয়ে গণসচেতনা তৈরি করে এই ধারণা অবসানের উদ্দ্যোগ তিনি নিয়েছিলেন।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসক হিসেবে মহুলবনী থাকাকালীন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ততোই সেখানকার মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাও দেখছেন খুব কাছ থেকে। শ্রীপতি মান্ডি এস.ডিও বাংলোর হোমগার্ড। বেতঝরিয়া তার বাড়ি। একবার ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেলে ফিরতে তার মন চায় না অন্য আরেকজন গার্ডের থেকে খবর নিয়ে জেনেছেন শ্রীপতি তার গ্রামে দুলৌড় (প্রেম) করছে। সাহেব তাকে বাপলা (বিয়ে) করার পরামর্শ দেয়। উত্তরে শ্রীপতি জানায়-

> "আমরা তো মান্ডি। আর সোহাগিরা কিসকু। আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় না।"[১০]

সাঁওতাল সমাজেও জাত পাতের সমস্যা রয়েছে তাদের মধ্যেও এক জাতির সাথে অন্য জাতির ঘোর বিরোধ তারা একে অপরের ঘরে নিজেদের সন্তানদের বিয়ে দেয় না। একথা যদিও তপনবাবু আগেই শুনেছিলেন সাঁওতাল ভাষা শিক্ষক বৈদ্যনাথ হাঁসদার কাছে। যদিও এই ধারণা আদিবাসী সমাজে বহু পুরনো তবুও তারা তাদের সমাজে এ বিষয়ে পুরনো ধ্যানধারণার মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। এদেশের সাঁওতাল শুধু নয়, গাঁয়ে-গঞ্জে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় কিশোরী থাকাকালীন। সোহাগি সংগ্রাম করে আঠারো হওয়া পর্যন্ত নিজের বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। তাদের গায়ের মুখিয়া শ্রীপতি এবং সোহাগির বাপলার ঘোর বিরোধী। তার বক্তব্য তাদের বাপলা হলে 'মারাং বুরু পাপ দেবে'। উপায়ান্তর না পেয়ে প্রেমে উন্মাদ শ্রীপতি সোহাগির অন্যত্র বিয়ে আটকানোর ভিন্ন পনহা অবলম্বন করে। শ্রীপতি সোহাগিকে অন্তঃসত্ত্বা করে দেয়।

সাঁওতাল সমাজের ব্যবস্থায় এই ঘটনার পরিনতি কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে শ্রীপতি আগে থেকেই অবহিত। সাঁওতালরা থানা পুলিশ করে না। ওরা নিজেরাই গ্রামে কুলহি (সালিশি মিটিং) ডাকে। কোন মেয়েকে বিয়ের আগে পোয়াতি করলে পাত্রকে মোটাটাকা জরিমানা দিতে হয়। চাকরি পাবার পর থেকেই শ্রীপতি তিন বছর ধরে টাকা জমিয়েছে এই জরিমানা দেবার। একই সাথে সে দুটো অপরাধ করেছে; এক জাতিগত বিরোধ দ্বিতীয়ত কুমারী মেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা করা। এসডিও সাহেব সে সময়েই মিটিংয়ে গিয়েছিলেন মহুলবনীতে। তাদের মধ্যে একজন শিক্ষক অখিল বেসরাকে দায়িত্ব দেন শ্রীপতির সমস্যার সমাধানের। গাঁয়ের একরোখা মুখিয়া জুড়োন মাঝিকে বোঝানোর। অবশেষে ইতিবাচক সমাধান 'দশ হাজার টাকায় রফা হয়েছে'। প্রেমের পরিচয় পেয়ে যায় বাপলা হয় শ্রীপতি সোহাগির।

বনকাঁটার এক বিতর্কিত চরিত্র মায়া হাসদা তার সম্পর্কে গ্রামের প্রচলিত আছে মায়া হাসদা নাকি জ্ঞান-গুণ জানে। লোককে জড়িবুটি ওষুধ দিতে জানে। ডাইনি প্রথার গভীর বিশ্বাস রয়েছে সাঁওতালদের। তারা মায়াকেও ডাইনি হিসেবে অনুমান করে। সে নাকি গভীর রাতে নগ্ন শরীরে একটি মুরগি হাতে তার আত্মা চুরি করতে গভীর জঙ্গলে চলে যায়। মান্ডি দম্পতির হত্যার পর খবর পাওয়ায় তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মায়ার ক্ষেত্রে ঘটনাটি উল্টো। গ্রামবাসীরা মায়াকে ধরে এনে বেঁধে রাখে মহুয়াগাছের গুঁড়ির সাথে। এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতিতে প্রশাসক খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উদ্ধার কার্যে। এসডিও সাহেব বার্তাটি পেয়ে রওনা হয়ে যান মহুলবনীর উদ্দেশ্যে। গ্রামের লোক গিরা বিচারের আয়োজন করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই তারা খবর আসে -

> "এইচডিপিও হাসি হাসি মুখে বললেন প্রব্লেম সল্ভড।
> -তার মানে? মায়া হাঁসদাকেকে ছেড়ে দিয়েছে ওরা?
> -ওরা ছাড়েনি মায়া নিজেই বুদ্ধি করে পালিয়েছে।... বিকেলের দিকে মায়া বলেছিল তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনের ডাক পড়েছে। এখনই তাকে বাড়িতে যেতে না দিলে, বলে মুখ বিকৃত করতেই ওরা তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি বাড়ি থেকে ঘুরে এসো'।"[১১]

বনকাটাঁয় নকুল বেসরা উধাও হয়ে যায়। নকুল নাকি স্বপ্ন দেখেছিল গায়ের মুখিয়া মারা গেছে। যদিও সাধারণত স্বপ্নের ওপরে কারো নিয়ন্ত্রণ থাকেনা। কিন্তু সাঁওতাল সমাজে সেটাও একপ্রকার অপরাধের। স্বপ্নের বিষয়ে মুখিয়ার কানে গেলে নকুলের ওপর কল্পিত হয়ে শাস্তির বিধান দিতে পারেন এবং মোটা টাকা ধার্য হতে পারে। বঙ্গার কাছে ক্ষমা চাওয়ার উদ্দেশ্যে সে চান্ডিল পাহাড়ের দিকে রওনা দেয়। ঘটনাক্রমে সেখানেই যাওয়ার পথে বাসনহাটি গ্রামের এক মেয়ের সাথে সে বাপলা করে সেখানেই ঘর বাঁধে। বঙ্গার দর্শন যাওয়া, নাকি পরিকল্পিতভাবে গ্রামের কঠোর শাস্তির থেকে পরিত্রাণ পেতে ঘড় ছেড়েছিল সে কথা একমাত্র নকুলেরই জানা। অনুমান করা যায় যে জরিমানা দেবার আর্থিক সামর্থ্য তার পরিবারের ছিল না। সেকারণেই হয়তো নকুল গ্রামান্তর হয়ে যায়। ঔপন্যাসিক এভাবেই প্রতিটি বিষয়ের সমাধান করেছেন এবং পাঠকের মন জয় করে নিয়েছেন। লেখকের জীবনের এক মন্ত্র -

> "ছুঁতে চাই না আকাশ, মাথা উঁচু করে হেঁটে যেতে চাই
> যেন হেরে না যাই জীবনযুদ্ধে।"[১২]

Reference:

১. বসু, অসিত কুমার, 'পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা', পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশকাল : জুন, ১৯৮৩, কলিকাতা ৭০০০১৩, পৃ. ২৩
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, 'মহুলবনীর মায়াম', মায়াকানন, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২, পৃ. ৯০
৩. তদেব, পৃ. ৯৪
৪. তদেব, পৃ. ৫৫

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 433 - 439
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. তদেব, পৃ. ৬৬
৬. তদেব, পৃ. ৭৫
৭. তদেব, পৃ. ৭৩
৮. তদেব, পৃ. ১১৯
৯. তদেব, পৃ. ১২১
১০. তদেব, পৃ. ১০৩
১১. তদেব, পৃ. ১৬৯
১২. তদেব, পৃ. ৯৪